শহীদ কাদরীর *উত্তরাধিকার* : কবির বিচ্ছিন্নতাবোধ ও আত্মযন্ত্রণার স্বরূপ

সোহানা মাহবুব*

সারসংক্ষেপ: সংবেদনশীল কবি শহীদ কাদরী তাঁর *উত্তরাধিকার* কাব্যে সমকালীন সময়কে চিহ্নিত করেছেন সুস্পষ্টরূপে। তিনি তাঁর সামসময়িক কালকে শুধু চিহ্নিতই করেননি, বরং সেই কালজাত সংকটের অভিঘাতে সংবেদনশীল কবিচেতনা কীভাবে সেকালের স্বদেশ ও সভ্যতার রূপাবয়ব নির্মাণ করেছে, *উত্তরাধিকার* কাব্যে তার ঋদ্ধ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ কাব্যে কবি এমন নির্লিপ্তভাবে তাঁর সময় ও সভ্যতাকে দেখেছেন, উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তশ্রেণির ভিড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছেন এবং নিজের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে এসে এমন এক অজ্ঞাতসত্তাকে ধারণ করেছেন, বোদলেয়র যাকে 'ফ্লনিয়র' অভিধায় অভিহিত করেছেন। শহীদ কাদরী নিজেকে এই সভ্যতায় বহিরাগত এক সত্তারূপে চিহ্নিত করলেও সভ্যতাসৃষ্ট ক্ষত নিজের ভেতর অনুভব করেছেন প্রবলভাবে। পুঁজিবাদী সমাজের বাইরে দাঁড়ানো হতাশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। শেষ পর্যন্ত, সভ্যতার ক্লান্তি ও ক্ষত থেকে মুক্তি পেতে তিনি কবিতার শরণ গ্রহণ করেছেন। কবিতাই হয়ে উঠেছে তাঁর একমাত্র আশ্রয়। সংবেদনশীল কবি শহীদ কাদরীর চেতনাধৃত সমকাল, সমাজ ও সভ্যতাজাত বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ নির্ণয় এবং সেই বোধ থেকে উদ্ভূত যন্ত্রণার স্বরূপ অন্বেষণই হয়ে উঠেছে বর্তমান প্রবন্ধের মূল অন্বিষ্ট।

শহীদ কাদরী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার প্রথম বই *উত্তরাধিকার*–এর ভেতরের কথাটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজে বহিরাগতের মতো জীবনযাপন। সেখানে একজন হতাশাগ্রস্ত লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, যাঁর কোনো রুট নেই' (শহীদ কাদরী, ২০১৯: ১৮)। কবির এই বক্তব্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে তাঁর *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭) কাব্যের কবিতাগুলোতে। শহীদ কাদরীর কৈশোর কেটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড় আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গাকবলিত উত্তাল সময়ের হাত ধরে। সাতচল্লিশে দেশভাগের পর আজন্মলালিত কলকাতার পার্ক সার্কাসের গণ্ডি ছেড়ে তাঁকে ঢাকায় চলে আসতে হয়। কাজেই শেকড়হীন এক বোহেমিয়ান সত্তা তাঁর ভেতর আজন্ম ক্রিয়াশীল ছিল। বাস্তুচ্যুতিজাত বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক যন্ত্রণা কাজ করেছে তাঁর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভেতর। সেটি পুঁজিবাদী সমাজের বাইরে দাঁড়ানো হতাশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির যন্ত্রণা। মূলত, সেকালের আধা পুঁজিবাদী এবং আধা সামন্তবাদী এক সমাজব্যবস্থা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাসী এই ব্যক্তিসত্তা সমাজের মূলস্রোতকে যেন প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে শ্রেণিতে তিনি জন্মেছিলেন, সে সমাজ থেকে মানসিকভাবেই তিনি ছিলেন 'ডিক্লাসড'। পিতা ছিলেন উচ্চপদস্থ ধনিকশ্রেণির একজন। জাঁদরেল পিতার অস্তিত্বে প্রবলভাবে প্রকাশমান ঔপনিবেশিকতার ছায়া ও উচ্চবিত্ত ঘরানার প্রতিচ্ছায়া শহীদ কাদরীর অবচেতনে এক গভীর শ্রেণি-বিমুখতার জন্ম দেয়। এ বিষয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

> ... নিজের শ্রেণীর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে সেখান থেকেও আমরা নিজেকেই নিজে নির্বাসিত করি। এখান থেকেও আমরা উদ্বাস্তু হই। শামসুর রাহমানের কথায়, 'কথা বানানোর আরক্ত কত তীক্ষ্ণ লজ্জা বুকে পুষে আমি হাঁটি মানুষের ধূসর মেলায় ...।' ... সমসাময়িক কবিতায়ও দেখা যায় এই মানুষটাকে– 'দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াই/ কলকাতার মরা নগরীতে আসে আলকাতরার মতো রাত্রি/ আর হাওয়ায় গোল্ডফ্লেকের গন্ধ/ হে মহাকাল আর কত কাল' (শহীদ কাদরী, ২০১৯: ১৯)।

উত্তরাধিকার কাব্যগ্রন্থটি ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত। কাজেই আইয়ুবী শাসনের অস্থির সময়পট পেরোনো এবং একাত্তরের আসন্ন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রায় মুখথুবড়ে পড়া স্বদেশ এবং সমাজ ও নগরকেই তিনি দেখেছেন এ কাব্যে; তবে সে দেখায় তিনি যেন ছিলেন এক বহিরাগত সত্তা। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাগরিকমনস্ক যে-আভিধানিক শব্দকৃতি তার পাশে শহীদ কাদরীর নগরভাষ্যচিত্র অনেক বেশি দৃশ্যমান এবং জীবন ও সময়-সংকট আচ্ছন্ন। এই সংকট নিজেকেই কুরে-কুরে খায়, উদ্বাস্তুর মতো ... বিচ্ছিন্নতাবাদের যেসব সূত্র কার্ল মার্কস উৎপাদন কাঠামোজাতরূপে দেখেছিলেন, আমরা শহীদ কাদরীর কবিসত্তায় সেই সবগুলো সূত্র ... দেখি। ... তৎকালীন কবিরা যেখানে প্রথম কাব্যের পরে দ্বিতীয়-তৃতীয় কাব্যে এসে হয়ে যান স্বজাতি-স্বদেশলগ্ন, আশাবাদে-সংগ্রামে উত্তেজনায় যোগযুক্ত, সেখানে যেন শহীদ কাদরী এক নির্বাসিত আত্মার মতো একলা ঘুরে বেড়ান শহরেই, ... (বেগম আকতার কামাল, ২০১৬: ৮)। নিজেকে এভাবে নির্বাসিত আত্মা কিংবা বহিরাগত ভাবার পেছনে কয়েকটি বিষয় তাঁর ভেতর গভীরভাবে কাজ করেছে। সেইসব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবার আগে বিচ্ছিন্নতাবোধের দার্শনিক-রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ব্যক্তি তার সকল সম্পর্ক থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে নৈঃসঙ্গ্যের ঘেরাটোপে কীভাবে বন্দি হয়ে পড়ে, কার্ল মার্কসই প্রথম সেটি চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর

সমাজ দার্শনিকদের মধ্যে জ্যাঁ জ্যাক রুশো, হেগেল, ফয়েরবাখ, হার্বার্ট মার্কিউস, জর্জ লুকাচ তাঁদের ব্যাখ্যাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে নানা মতবাদ প্রদান করেন। তবে কার্ল মার্কসই প্রথম মনস্তাত্ত্বিকতার বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্নতাকে মুক্তি দিয়ে একে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণিশোষণের পটভূমিতে দেখতে চেষ্টা করেন। মার্কস মনে করেন, মানুষ তার সৃষ্ট উপাদান বা শ্রমজাত ফসল থেকে যখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই তার ভেতর এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। তিনি মনে করেন, 'The worker becomes an ever cheaper commodity the more commodities he creats' (Karl marx, 1977: 68)। এভাবেই মানুষ ক্রমশ নিজের কর্মপদ্ধতি, শ্রমফসল, নিজ সত্তা এবং সামাজিক সম্পর্কস্রোত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মার্কসের মতো সার্ত্রেও মনে করেন, শ্রম-বিচ্ছিন্নতা এবং পুঁজিবাদী শ্রমশোষণই মানুষের বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। সেই সঙ্গে মানুষের আদি বিচ্ছিন্নতা যে তাকে সমাজকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, অস্তিত্ববাদের সেই বিষয়টিও তিনি মার্কসের বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, এডলার, ফ্রম এবং ল্যাঙ প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ বিচ্ছিন্নতাবাদীতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে এরিক ফ্রম মার্কস এবং ফ্রয়েডের তত্ত্বের মিথস্ক্রিয়ায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সমাজেকাঠামো নয়, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধজাত নৈঃসঙ্গ্যের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তিমনের গভীরেই। এভাবেই কালে কালে বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। শহীদ কাদরী যে গভীর সংকটাপন্ন দেশকালের ভেতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন, সেটি তাঁকে সভ্যতার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। সাতচল্লিশোত্তর ঢাকার যে ছবি তিনি তাঁর কবিতায় এঁকেছেন, তার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছিল। সেই জটিল নগর ও নাগরিক সময়টিই তাঁকে এক নির্বাসিত আত্মার জনক করে তোলে। সমালোচকের ভাষায়:

> সাতচল্লিশের সদ্য স্বাধীন দেশে আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশ ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে। সাতচল্লিশের সদ্য-স্বাধীন দেশে আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশ অচিরেই অর্জনের আনন্দকে করে তোলে নিষ্প্রাণ।...বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনও রক্তক্ষয় কোনো সমাধান দেয় না। তারপরেও দুই দশক জুড়ে সামরিক শাসন ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রসূত স্বাধীনতাও অল্পকাল পরেই পরিণত হয় শবে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে সাথে যুগপৎ সক্রিয় থাকে সামাজিক অস্থিতি। অবশিষ্ট সামন্ত বিকারের সাথে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের সূত্রে নব্য ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভবে ঢাকার চরিত্র হয়ে ওঠে আধা-সামন্তিক, আধা বুর্জোয়া। ঢাকা হয়ে ওঠে স্থূল, অসৎ, অনান্তরিক। বিত্ত সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক হয়। নগর-মানসে যুক্ত হয় যান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতা-চাতুর্য-দুর্নীতি-বেকারত্ব, হতাশা; বাড়ে বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা, নির্বিকারত্ব।...নির্মীয়মাণ ঢাকার অসম্পূর্ণ নগর-মানসের বিচিত্র জটিলতা, বিচূর্ণ বিকার শহীদ কাদরীর... নৈঃসঙ্গ্য এবং যন্ত্রণার উৎস (তারানা নূপুর, ২০০৬: ১১৫)।

এরকম একটি সময়-সংঘাত ও নগর-জীবন সংবেদনশীল ব্যক্তির ওপর গাঢ় প্রভাব রেখে যায়। ষাটের দশকের কবিরা যে টালমাটাল সময়ের মধ্য দিয়ে গেছেন, স্বাভাবিকভাবেই সেটি তাঁদের প্রচলিত সমাজশাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলে। সামসময়িক ঘটনাবলি তাঁদের করে তোলে 'বহিঃস্রোতক্ষুব্ধ'। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মত প্রণিধানযোগ্য:

> চল্লিশ দশকের শেষাংশ, ও সমগ্র পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশক ভ'রে এমন এক দারুণ সময়ের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগোয় বাঙলাদেশ যে এ-সময় আপন অন্তর্লোকের একান্ত অধিবাসী হওয়া সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে। প্রত্যেককেই প্রথমে হ'তে হয়েছে রাষ্ট্র ও জীবনের বাসিন্দা, পরে অন্য সব কিছু–কবি অথবা ধ্যানী; এবং উত্তেজনা-কলরোল-বাস্তব পীড়নপূর্ণ বাহ্যজীবন-জগত পেরিয়ে এক সময় আপন অন্তর্লোকে পৌঁছে বাঙলাদেশের কবিরা দেখেছেন: আন্তর জগতজীবনকেও দখল ক'রে আছে বাহ্যজগত আর জীবন। একান্ত ব্যক্তিতা ও ব্যক্তিগত স্বপ্নকল্পনা বিদায় নেয় নি তাঁদের বুক থেকে, কিন্তু গুটিয়ে নিয়েছিলো নিজেদের– ...এমন প্রতিবেশে ও মানস-অবস্থায় কবিতাও বাহ্যজীবনময় হ'য়ে উঠতে বাধ্য; এবং হয়েছে তা-ই: সাতচল্লিশ, বিশেষ করে বায়ান্নোর পরে বাঙলাদেশের কবিতায় প্রধান জায়গা ক'রে নেয় জীবন–তার ক্ষুধা, হাহাকার, ক্রোধ, উত্তেজনা; এবং কবিতা হ'য়ে ওঠে বহিঃস্রোতক্ষুব্ধ (হুমায়ুন আজাদ, ১৯৮৩: ২০-২১)।

সেকালের কবিতার এই বহিঃস্রোত সমকালের কবিদের ভেতর ফেনিয়ে তোলে রাষ্ট্র-সমাজ ও সমকালের নানা ভাবনাকে। সেই সঙ্গে সংক্ষুব্ধ সময়জাত সমকালের একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্যান্দোলনে এ কালের কবিচেতনা আরও বেশি স্পৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিট জেনারেশন আন্দোলনের জন্ম হয়, যার প্রবক্তা ছিলেন গিন্সবার্গ, উইলিয়ম বরো এবং জ্যাক কেরোওস। এঁদের প্রবর্তিত এক ম্যানিফেস্টোতে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ, শৈলীগত পরিবর্তন, বিকল্প যৌনভাবনা, প্রাচ্যধর্মের প্রতি আকর্ষণ, বস্তুবাদের প্রতি প্রত্যাখ্যানবার্তা ঘোষিত হয়। সাহিত্যান্দোলনের তরঙ্গিত এই হাওয়া পশ্চিমবঙ্গের কবিদের ভেতর আলোড়ন তোলে। বিট জেনারেশন বা অ্যাংরি জেনারেশনের আদলে সেখানে ১৯৬১ সনে গড়ে ওঠে হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর আন্দোলন। সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবী রায় ছিলেন এই আন্দোলনের মূল উদগাতা, যাঁরা জিওফ্রে চসারের 'ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম' বাক্য থেকে দেশভাগোত্তর কালখণ্ডকে ক্ষুৎকাতর সময়পরিসররূপে চিহ্নিত করেন। হাংরি আন্দোলন প্রথম যৌথভাবে প্রান্তিকের ডিসকোর্সকে স্থান দেয়, বাক্যবুননে যৌক্তিক ক্রম

ভাঙা হয়, ব্যঙ্গ, অসঙ্কোচে আত্মপরিহাস, নিষ্ফলতার যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটায় এবং প্রচলিত ব্যবস্থার গায়ে আঘাত করার সাহস সঞ্চার করে দেয়। এইসব প্রবণতা বাংলাদেশের ষাটের দশকের কতিপয় কবিদের আমূল আলোড়িত করে। তাঁরা নিজেদের 'স্যাড জেনারেশন'-এর কবিরূপে চিহ্নিত করেন। গতানুগতিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ পায় তাঁদের কাব্যপ্রচেষ্টা। পঞ্চাশের দশকের কবি কর্তৃক আঙ্গিক, ছন্দ কিংবা কবিতার যে নান্দনিকতার প্রচলন ছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ষাটের কবিরা নতুন পথ খুঁজছিলেন। স্যাড জেনারেশনের অন্যতম কবি রফিক আজাদ কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে যে মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে ষাটের কবিদের সামসময়িক সংক্ষুব্ধ সময়জাত অসহায়ত্ব, বিষণ্নতা আর বিপন্নতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ম্যানিফেস্টোতে তিনি লিখছেন:

> An idiot poet wrote: Time is a thief. I am protesting that time can never be a thief. We are thieves, we are stealing the golden clock of time and destroying it. We have nothing but to be.
>
> We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless.We are poisoning us consciously.Yet we are helpless and helpless….We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION…We hate conventional life. We cannot tolerate the conventional notions of private and public MORALITY. LIFE is meaningless, we are living meaninglessly.
>
> We are not Beatniks or Angries, remember. We are 'Bipanna'. And that's why we are SAD.
>
> We are for no time, interested in politics and newspapers.
>
> Then, What do we want? NOTHING, NOTHING, we want nothing from our bloody society.
>
> We are exhausted, annyoed, tired and 'sad' (মাহমুদ কামাল, ২০১৭: ৫৩০).

স্যাড জেনারেশনের কবিদের ক্লান্ত, বিপর্যস্ত এবং যন্ত্রণাকাতর আর্তির প্রকাশ মেলে এই ঘোষণাপত্রে। এই ক্লান্তি বিশ শতকের আধুনিক নগরজীবনের চিত্রকর কবিদের ক্লেদ, যন্ত্রণা কিংবা ঊষরতার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায়। তবে একে শুধু কালজাত বিপন্নতা বলা যাবে না। ষাটের দশক তখন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল, উন্মত্ত। স্বাধীকার আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অংশগ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। এরকম এক বিরুদ্ধ

প্রতিবেশে স্যাড জেনারেশনের কবিদের এই বিপন্নতার বোধ কখনও কখনও আরোপিত বলে মনে হয়। বোধ করি, উচ্চবিত্ত-সুবিধাভোগীশ্রেণির একজন হিসেবে তাদের ভেতর এক সুগভীর গ্লানিবোধ ফেনিয়ে ওঠে। সেকারণেই মূল জনস্রোত থেকে তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তোলেন। এই গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা আশ্রয় খোঁজেন নিজের যাপিত বৃত্তাবদ্ধ জীবনের ভেতর। বৃত্তাবদ্ধ জীবন তাঁদের ভেতরকার বিপন্নতার বোধকে আরো বেশি গাঢ়বদ্ধ করে তোলে। এ পর্যায়ে তাঁরা খুঁজে পান আরো একটি নতুন কবিতাপ্রবণতার আদল। আধুনিক নগরজীবনের যুগপৎ ক্লেদকৈবল্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ যাঁর আঁচড়ে রূপায়িত হয়েছে, সেই বোদলেয়র কিংবা যুদ্ধোত্তর ঊষর নগর ও নগরের অক্ষম-সৃজনীপ্রতিভাহীন মানবমিছিলের চিত্র আঁকলেন যিনি, সেই এলিয়টের কবিকৃতি তাঁদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে, বোদলেয়র হয়ে ওঠেন তাঁদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বোদলেয়র তাঁর 'The Painter Of Modern Life, and Other Esseys' বক্তৃতায় এমন এক নাগরিক ব্যক্তিসত্তার উল্লেখ করেন, যাঁকে তিনি সে বক্তৃতায় "ফ্লনিয়র" অভিধায় অভিহিত করেছেন। এই ফ্লনিয়র সত্তারই বিচরণ অনুভূত হবে কবি শহীদ কাদরীর প্রথম দিককার কাব্য *উত্তরাধিকারের* বেশ কয়েকটি কবিতায়। বোদলেয়র ফ্লনিয়র সম্পর্কে লিখেছেন:

> For the perfect flanuer, for the passionate spectator, it is an immense joy to set up house in the heart of the multitude, amid the ebb and flow of movement, in the midst of the fugitive and the infinite. To be away from home and yet to feel oneself everywhere at home; to see the world, to be at the center of the world, and yet to remain hidden from the world---such area a few of the slightest pleasures of those independent, passionate, impartial natures which the tongue can but clumsily define. The spectator is a prince who everywhere rejoices in his incognito…he marvels at the eternal beauty and the amazing harmony of life in the capital cities,…he gazes upon the landscape of the great cities---he delights in universal life (Charles Baudelaire, 1965: 9-11).

এখানে বোদলেয়র 'ফ্লনিয়র' অভিধায় যুক্ত করেন এরকম এক ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ, অনির্দিষ্ট পথই যার মূল গন্তব্য। যার কোনো তাড়না নেই, নির্লিপ্তভাবে যে ব্যক্তি পাশ কাটিয়ে যায় পুঁজিবাদী সভ্যতার পণ্যপসরার চাকচিক্য। আধুনিকতাবাদ বা মডার্নিজমের গর্ভ থেকে জন্ম এ সত্তার। সুপুষ্ট, মাংসল ভিড়ের একজন হয়ে হেঁটে যাওয়া নির্লিপ্ত এক মনোভঙ্গির জনক এবং মহানাগরিক হয়ে ওঠাতেই এই সত্তার সার্থকতা, যার ভেতর

কালের ক্ষত সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত। জনসমুদ্রে, পণ্যবাজারের শোভায়, ভিড়ে, দোকানপাটের কেনাবেচায় সে এক 'ভিড়ের মানুষ', যদিও শুধু 'ভিড়ের মধ্যকার মানুষ' নয়। অর্থাৎ ভিড়ের ভেতরেও যে সত্তা নিজেকে তার চেতনাগত বোধের সাহায্যে একাকিত্বের ঘেরাটোপে বন্দি রাখতে জানে, তিনিই মূলত ফ্লনিয়র। একজন ফ্লনিয়র পুঁজিবাদী ব্যস্ত শহরের চলমান ছবিগুলোকে চেতনায় ভরে নেন। তার এ যাত্রা উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন এবং গন্তব্যহীন। কোথাও যাবার তাড়া নেই, ভিড়ে সে ভারাক্রান্ত নয়; বরং স্বাধীন ও নামহীন এই ফ্লনিয়র সত্তা কবিতার প্রধানতম নিয়ামকশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এই ভিড়াক্রান্ত জনগণ ও তার পারিপার্শ্বকে। শুধু বোদলেয়র নন, ফ্লনিয়র অভিধা নিয়ে কাজ করেছেন অ্যানাইস বাজিন (১৭৯৭), বালজাক (১৭৯৯), স্যাঁৎ বভ (১৮০৪), ভিক্টর ফুরনেল (১৮২৯) এবং ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২)। সমকাল, নগর ও সংক্ষুব্ধ সময়পট এ সত্তার নির্মাতা। নানা কালে সৃষ্টিশীলদের সাহিত্যকৃতিতে ফ্লনিয়র ভাবকল্প সুপরিস্ফুট হয়েছে। মলয় রায় চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন:

> উনিশ শতকের প্যারিস মহানগরের পথে পথে টহলক্রিয়াকে চিহ্নিত করে শার্ল বদল্যার একটি ভাবকল্প তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ক্রিয়াটিকে তিনি বলেছেন 'ফ্ল্যানেরি' এবং ওই পথচর দর্শককে বলেছেন 'ফ্লনিয়র'।... আধুনিকতা দেশে-দেশে গড়ে তুলছিল মহানগর, এবং সেই মহানগরগুলোয়, আধুনিকতার অবদানরূপে দেখা দিচ্ছিল আলোকময়তার পরিসর ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরিসর; বৈভবশালীর এলাকা ও ভিখারি জুয়াড়ি নেশাখোর যৌনকর্মী অপরাধী ও শ্রমিকদের এলাকা। গ্রিক পুরাণে আছে যে ক্রিট দ্বীপে ছিল এক সর্পিল জটিল বিভ্রান্তিকর ভুলভুলাইয়া, আর সেই ভুলভুলাইয়ায় থাকত মাইন্যটর নামের বৃষাসুর, ... জার্মান ভাবুক ওয়াল্টার বেনিয়ামিন ভুলভুলাইয়ার এই গ্রিক রূপকটিরর তুলনা করেছেন নতুন গড়ে ওঠা উনিশ শতকের ইউরোপীয় মহানগরের সঙ্গে।... ১৮৬৩ সালে, যে-সময়ে প্যারিস শহরকে পুঁজিবাদের চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছেন তৃতীয় নেপোলিয়ন ও ব্যারন হাউসমান, সে-সময়ে, চারিদিকের ঝিকমিকে ঝিলমিলে দোকান-পশার ও তা উপভোগের জন্য উপচে-পড়া জনসমুদয়কে বিশ্লেষণ করে, নিজেকেও সেই আয়নায় প্রতিফলিত দেখে, 'লে ফিগারো' পত্রিকায় শার্ল বদল্যার একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার শিরোনাম ছিলো 'আধুনিক জীবনের চিত্রকর'। রচনাটিতে তিনি ফ্লনিয়র (Flaneur) শব্দটি প্রয়োগ করেন। ... যে লোকটি পথে-পথে গন্তব্যহীন অলস পায়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাকে তিনি বলেছেন ফ্লনিয়র। লোকটাকে ভবঘুরে (Vagabond) বলা যাবে না। সে কোনো-কিছুর ক্রেতা নয়, কেননা সে শপিং করতে বেরোয়নি।...বস্তুত ফ্লনিয়র লোকটি নিজে একজন অজ্ঞাত সত্তা।...পুঁজিবাদী সমাজের দুটি প্রধান অনুজ্ঞাকে সে অবহেলা ও অস্বীকার করছে: প্রথমত তার তাড়া নেই এবং দ্বিতীয়ত তার কিছু কেনার নেই, ... (মলয় রায় চৌধুরী)।

বোদলেয়রের "ভিড়" কবিতা বিশ্লেষণে করলে অনুভূত হবে পুঁজিবাদী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত ফ্লনিয়র সত্তার তাগিদহীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা। "পাশ দিয়ে যাওয়া পথচারিণী", প্যারিস স্বপ্নের "সূর্য", "সান্ধ্য প্রদেশ", "প্যারিস-স্বপ্ন" ইত্যাদি কবিতায় ফ্লনিয়র সত্তার রূপচিত্র এঁকেছেন বোদলেয়র। এই জনমানুষের পাশাপাশি, পুঁজিবাদী সভ্যতাপিষ্ট পিঁপড়ের সারির মতো ক্লান্তিহীন পায়ে হেঁটে যাওয়া জনগণের যে চিত্র *ওয়েস্টল্যান্ড* কাব্যে এঁকেছেন এলিয়ট, সেখানেও ফ্লনিয়র সত্তার পরিচয় মেলে। আমরা দেখি হতক্লান্ত জনতার সারি বৃত্তাবদ্ধ পায়ে বাড়ির দিকে ছুটছে:

> Unreal City,
> Under the brown fog of a winter dawn,
> A crowd flowed over London Bridge, so many,
> I had not thought death had undone so many.
> Sighs, short and infrequent, were exhaled,
> And each man fixed his eyes before his feet (T. S. Eliot, 1983: 1002).

হতক্লান্ত এই জনতার ভেতর ফ্লনিয়র সত্তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। পুঁজিবাদী সমাজ-সভ্যতাকে অবজ্ঞা করে তাড়নাহীন, তাগিদহীন হেঁটে বেড়ানো এই অজ্ঞাত সত্তার রূপকার হয়ে উঠেছেন শহীদ কাদরীও। নগর, সমকাল ও বিপন্ন স্বদেশই কবির ভেতর এই অজ্ঞাত সত্তার জন্ম দিয়েছে বলে মনে হয়। এ সত্তা ধারণ করেই কবি শহীদ কাদরী দেখেছেন *উত্তরাধিকার* কাব্যের নাগরিক বৃষ্টি, যে বৃষ্টি পুঁজিবাদী শ্রেণির জীবনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। এ জলে নেই পেলবতা। বরং 'তীব্র', 'হিংস্র' 'খল' সেই ধারাজলের আঘাতে পলায়নপর উচ্চবিত্তশ্রেণির কাপুরুষোচিত আচরণ শহীদ কাদরীর চেতনায় এনেছে এক অদ্ভুত উপলব্ধি; কবিতায় বৃষ্টি হয়ে উঠেছে বৈষম্যতাড়িত-সভ্যতা ধ্বংসের প্রতীক। প্রচলিত কাঠামো ভাঙার আদলে নির্মিত বোহেমিয়ান কবির অদ্ভুত "উড়োনচণ্ডী" হৃদয়ে বেজেছে সেই জলের বন্দনা। কবির বর্ণনায় উঠে আসে ঝা চকচকে বেসামাল এভিনিউ, বিধ্বস্ত-পুঁজিবাদী সমাজের আর্তনাদ আর মোটরাবদ্ধ ত্রস্ত যাত্রীর উৎকণ্ঠা:

> রাজস্ব আদায় করে যারা,
> চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
> পালিয়েছে ভয়ে।
> ... ...
> সিপাই, সান্ত্রী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিল যারা,
> পালিয়েছে ভয়ে।

পালিয়েছে, মহাজ্ঞানী, মহাজন মোসাহেবসহ
অন্তর্হিত, ...
(বৃষ্টি, বৃষ্টি)।

কবিতায় এই বৃষ্টি মূলত পুঁজিবাদী শক্তি বিনষ্টকারী শক্তির প্রতীক। কবি জানেন, এ বৃষ্টি শুধু সর্বহারাদের জন্য স্বস্তির। উচ্চবিত্ত শ্রেণির চোখে যারা লক্ষ্মীছাড়া, আজ এই বৃষ্টিস্নাত নগরীতে রাজত্ব শুধু তাদের:

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মূল, উদ্বাস্তু
বালকের , আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ
(বৃষ্টি, বৃষ্টি)।

কবি স্পষ্টতই উল্লাসমুখর এই দ্বিতীয় দলের রাজত্বের পক্ষপাতী। তবু এই দুটো দলকেই তিনি দেখছেন দূর থেকে। কেননা, কবিতার শেষ স্তবকে তিনি নগ্নপায়ে, ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী সত্তায় বিচরিত, যাঁর বিপর্যস্ত রক্তমাংসের ভেতর নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা কেবল দ্রোহের আগুন জ্বেলেছে, তবু একটি ঝকঝকে, সদ্য নতুন নৌকার প্রতীকে প্রকাশিত কবির চেতনা দ্রোহী জলের আহ্লাদে একা ভেসে যায়। এই 'একা ভেসে যাওয়া'র চিত্রকল্পে কবির নৈঃসঙ্গ্যবোধ হচ্ছে তাঁর স্বশ্রেণিচ্যুতির। কবি দু'শ্রেণির কোনো শ্রেণিকেই ধারণ করেননি। বরং তাঁর অজ্ঞাতসত্তা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে এখানে। একে, এই 'অজ্ঞাত সত্তা'কে কবির ফ্লনিয়র সত্তা বললে অত্যুক্তি হয় না।

শুধু এই কবিতায়ই নয়, অজ্ঞাত সত্তার একাকিত্ব, তাড়নাহীন পথচলা তিনি অনুভব করেছেন "নপুংসক সন্তের উক্তি" কবিতায়ও। কবি শান্ত, শুদ্ধ আতর-লোবান পরিপুষ্ট অতিমর্ত্যলোকের মতো নগরে নিজেকে নিঃসঙ্গ এক উদ্বাস্তু মনে করেন। এই পরাধীন নগরীতে কবি এক অনিকেত সত্তা। উপলব্ধি করা যাবে, বোদলেয়রের ফ্লনিয়র বা অজ্ঞাত সত্তাকেই আঁকড়ে ধরেছেন শহীদ কাদরী তাঁর *উত্তরাধিকার* কাব্যের কবিতাগুলোয়। এরকম আরেকটি কবিতা "আমি কিছুই কিনবো না" তে উল্লিখিত ফ্লনিয়র বা অজ্ঞাত সত্তার লোকটিকে আমরা প্রবলভাবে দেখতে পাই, যেখানে তিনি আধা-সামন্ত, আধা-পুঁজিবাদী এক নগরের ছবি এঁকেছেন; শামসুর রাহমানের *রৌদ্র করোটিতে* কিংবা *বিধ্বস্ত নীলিমা* ষাটের দশকেই প্রকাশিত দুটো কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থগুলোর কিছু কিছু কবিতায় ভিখিরি, খঞ্জের মতো সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবিত্ত শ্রেণির কথাও উঠে এসেছে,

যেমনটা এসেছে শহীদ কাদরীর কবিতায়ও। কিন্তু শামসুর রাহমানকে পাঠকেরা সেখানে কখনও কখনও ভিখিরি বা খঞ্জের কণ্ঠ ধারণ করতে দেখেন, যেখানে শহীদ কাদরী তাঁর *উত্তরাধিকার* কাব্যে উচ্চবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত এই দুই শ্রেণির কোনো শ্রেণির সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেননি। তবে, শামসুর রাহমান নিজেও কিন্তু তাঁর কবিতাগুলোতে বহিরিস্থিত এক সত্তা। সমালোচক মনে করেন, তাঁর "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে" কবিতায় 'যে তিনজন গোরখোদকের কথা বলা হয়েছে, কবি নিজে কোনো অর্থেই তার অংশ নন। অর্থাৎ বলার কথাগুলো তাঁর নিজের কথা নয়, এমনকি তাঁর শ্রেণিরও নয়' (মোহাম্মদ আজম, ২০২০: ১৬৮)। মূলত, শামসুর রাহমান স্বশ্রেণির বাইরের কণ্ঠটিও তাঁর লেখনীতে সহজভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে সমালোচক হুমায়ুন আজাদের মূল্যায়ন মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলেন:

> তিনি জন্ম আউটসাইডার বা বহিরিস্থিত, যার স্মৃতিলোক ও ভবিষ্যৎব্যাপী ছড়িয়ে আছে শবের গন্ধ ও অন্ধকার। কিন্তু তিনি জীবনে সমাজে প্রবেশ করতে চান, তবে তাঁর সামনে জীবনের সমস্ত দরোজা বন্ধ। যেহেতু ভেতরে ঢুকতে পারেন না, তাই জীবনকে দেখেন তিনি দরোজার ছিদ্রপথে। ক্রমশ তিনি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেন, কিন্তু সুস্থতার বদলে ঘিরে থাকে তাঁকে অসুস্থতা। আত্মহত্যা তাঁকে উৎসাহ দেয়, কোনো বিশ্বাস তাঁকে অনুপ্রাণিত করে না, তিনি জীবনের বিশাল দিগন্ত ভ'রে টাঙানো দেখেন একটি বিশাল 'না'। যা তাঁকে সুখ দেয় , তা কবিতা–শিল্পকলা। এ ধারাতেই এগিয়েছে আমাদের কবিতা পঞ্চাশ-ষাটের দশক ভ'রে,...(হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯২: ৩০)।

মূলত, এ কালের কবিদের কবিতার এক মূলপ্রবণতা হয়ে উঠেছে এটি। কবিরা পকেটভর্তি স্বপ্ন নিয়ে ক্লান্তপায়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন অজ্ঞাত ব্যক্তিসত্তার আদল পরিগ্রহ করে। এমনকি প্রকৃতিও তাঁদের শোনাতে পারেনি কোনো নিরাময়ের কথা। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের "পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ" কবিতার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে তিনি বলছেন, অর্ধদগ্ধ বিড়িটাকে শুকনো ঠোঁটে চেপে/ তাকায় রাস্তার ধারে চাঁদহীন মাঠে/ অদ্ভুত বিকৃত মুখে যেন/ পৃথিবীর কোনো সত্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে/ আস্থা নেই তার যেন একটি কর্কশ পাখি ("পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ")। মূলত, সমকালের স্বদেশ-সমাজের ক্ষতবিক্ষত, হতশ্রী চেতনায় বহন করেন বলেই এ কালের কবিদের কবিতায় দুর্মর নিঃসঙ্গতার বোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক:

> এ কালের আধুনিকেরা বনের বন্ধুতায় প্রকৃতি-এষণাকে অর্পণ করেন না, আত্মমুক্তির পরিসরও খোঁজেন না। শহুরে পার্কে, ভিড়াক্রান্ত রাজপথে, হাজার মুখের আলো-ছায়ায় রাহমানের কাব্যিক অভিজ্ঞান আর সংবেদ বস্তুসঙ্গতি খুঁজে পায়। কিন্তু এইসব বস্তুসঙ্গতি

কিছু অহেতুকতার সংস্পর্শসহ শেষ পর্যন্ত কবির নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতাকেই সংকেতিত করে। তবে, প্রকৃতি-এষণা বা পার্কে রাজপথে অবস্থান–যা-ই হোক, কোনো অপেক্ষা ও প্রতীতির আশ্বাস জাগায় না। পরিবর্তে, বিপন্ন সময়দেশের অভিঘাতে ভঙ্গুর অবচেতন পরিসরটিকে খুঁড়ে বার করে আনে (বেগম আকতার কামাল, ২০১৪: ৪২)।

শহীদ কাদরীর "নিসর্গের নুন" কবিতায়ও এই ভাবনার অনুরণন মেলে। মূলত, বিপন্ন এই সময়প্রতিবেশে প্রকৃতি কোনো শুশ্রূষার বাণী বয়ে আনতে পারেনি কবির চেতনায়, কবিতায় সেকথাই বলেন কবি। জন্মরাত্রির উৎসবের আলো তাঁর চেতনাকে আলোকিত করলে কখনও কখনও তিনি স্বস্তি পেতে শৈশবে ফিরে যেতে চান। যদিও, গত হওয়া শৈশব তাঁকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দেয় না। বর্তমানের যে জীবন তিনি যাপন করছেন, সেই ঠাণ্ডা, করুণ, মৃত মেঝেতেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। যে নগরে তিনি যাপন করেছেন তাঁর যৌবন, সেই নাগরিক জীবনের ক্লিন্ন, কুৎসিত মুখাবয়ব তাঁকে ঠাণ্ডা এক মৃত সভ্যতারই মুখোমুখি করে। আত্মস্বীকৃত কবির উচ্চারণ, একমাত্র কবিতাই আরাধ্য। যে সভ্যতায় তিনি নিজেকে বহিরাগত মনে করেন, যে সভ্যতায় তিনি নিজেকে 'উপাধিবিহীন', 'উন্মূল', 'উদ্বৃত্ত' বলে জানেন, যে সভ্যতায় তিনি কোনোমতে টিকে থাকা এক বেঢপ তানপুরার মতো ভূমিকাশূন্য ("কবিতাই আরাধ্য জানি"), সে সভ্যতায় একমাত্র কবিতাই তাঁকে আশ্রয় দেয়। পিতামহের দেখিয়ে যাওয়া পথও আজ দ্যুতিহীন, মৃত বলেই তাঁর মনে হয়। কবি উপলব্ধি করেন, এ সভ্যতা আজ মৃত। বোদলেয়রের মতোই তিনি চারপাশে দেখতে পান নষ্ট ক্ষেত, নষ্টফল। সভ্যতা পরিণত হয়েছে 'ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ক্ষুধামত্ত জন্তু'তে। কবি যে সময়কে ধারণ করেছেন, সে সময়কে তিনি আখ্যায়িত করেন 'উদ্বাস্তু দশক' হিসেবে। কবির চেতনায় ধারণকৃত সময়ে জরা, মৃত্যু, মূল্যবোধ, আর্তির ভেতর তিনি নিজের আততায়ী শয়তানের ধূমল মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। অর্থাৎ নিজের জন্মের ভেতরেই বিপন্ন সভ্যতার কুৎসিৎ অবয়ব দেখেন। জীবনের ক্লেদ, ক্ষত কিংবা কদর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেন বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, এবং সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন:

ফলত নিঃশব্দে নেমে পড়ি
কবিতার শুঁড়িলোকে, মদ্যপের কণ্ঠনালী বেয়ে
মিশে যাই পাকস্থলীর, প্লীহার অম্ল রসায়নে।
(নিরুদ্দেশ যাত্রা)।

"উত্তরাধিকার" কবিতায়ও জন্মমাত্র মাতৃজরায়ন থেকে নেমে আসা কবির কুঁকড়ে যাওয়া সত্তার প্রকাশ মেলে। এ কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্ল্যাকআউটে সন্ত্রস্ত শহরে

বিদেশি পতাকার নিচে জন্মানো জড়োসড়ো এক বালকের রক্তপাত আর হত্যাযজ্ঞের মারণমন্ত্রে বেড়ে ওঠা উন্মূল অস্তিত্বের আর্তনাদ শোনা যায়। দেশভাগের কদর্য অভিজ্ঞতা কিংবা উন্মূল জীবনের হাহাকার, সেইসঙ্গে মূল্যবোধগত বিপর্যয় কবির শৈশব কৈশোরের নির্মল আনন্দযজ্ঞে ত্রাস জাগায়। ক্রমাগত বেড়ে উঠতে গিয়ে কবি হোঁচট খেয়ে জানতে পারেন:

মূল্যবোধের আর যা কিছু সত্য তাই হতাশার
পরম, বিশ্বস্ত অনুগামী, প্ররোচক বুঝি স্বেচ্ছামরণের,
–এই মতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিষ্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো
বিপদ–সংকেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো
অনিদ্রায়
(উত্তরাধিকার)।

'সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি' (বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৯: ১৯) কবির অনায়ত্ত! কাজেই এই ভাবনা তাঁকে রক্তাক্ত করে। ফিরে ফিরে আসে কবির ফ্লনিয়র সত্তার আকুতি। পুরো শৈশব-কৈশোর জুড়ে এক মারণযজ্ঞে তাঁর বেড়ে ওঠার বিষয়টি তাঁকে মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। করে তোলে নির্লিপ্ত। সমালোচক মন্তব্য করেন:

নগরজীবনের সন্ত্রাস, ক্লেদ ও পতন শহীদ কাদরীর প্রথম গ্রন্থ *উত্তরাধিকার*–এ এতটা মহামহিম যে, এই গ্রন্থের সব কবিতাকে একজন নিশাচর নগর পথিকের দিনলিপির বিস্তারণ ভাবা যায়। ...আত্মধিক্কার ও পাপচেতনা, নগরের সন্ত্রাসদৃশ্যসমূহ, বেশ্যা ও ভিখিরীর ভিড়, কুৎসিত রোগাক্রান্ত মানুষের শারীরিক পচনের উল্লেখ, ইত্যাদি বোদলেয়রীয় ভাবানুষঙ্গ ও প্রতিবেশ যুক্ত হয়েছে কাদরীর কবিতায় (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ২০১৬: ৩৯)।

সাতচল্লিশের সদ্যস্বাধীন, আধা ঔপনিবেশিক নব্য ঢাকার পথ জুড়ে হেঁটেছেন শহীদ কাদরী। তাঁর সেই পরিব্রাজক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে উপরিউক্ত অন্য কবিতার সঙ্গে "আমি কিছুই কিনবো না" কবিতায়। এ কবিতায়ও কবির একাকী, নিঃসঙ্গ সত্তার প্রকাশ লক্ষণীয়। উৎসবে, জয়ধ্বনিতে তিনি বিজ্ঞাপনের আলোয় হাঁটেন: একা। ঢাকা তখনও পুরোপুরি পুঁজিবাদী নগরীর তকমা আঁটতে পারেনি শরীরে। তবু উপলব্ধি করা যাবে, আধা-সামন্তবাদী আধা-পুঁজিবাদী শহর কবির স্বপ্নের উপমায় স্থান করে নেয় এভাবে, যখন

তিনি বলেন, 'নতুন, সোনালি পয়সার মতন দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার/ আর জ্যোৎস্নার ঝলক আমার/ আমার ঝলসানো মুখের অবয়বে।' এবং তারপর কবি সুদৃশ্য বিপণিবিতান, সারি সারি লোভনীয় রেস্তোরাঁ, পার্ক করা নিষ্প্রাণ-ঝা চকচকে গাড়ির সারি, সিনেমার লম্বা কিউ এর বর্ণনা দিয়েছেন; এ বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এলিট শ্রেণির আভিজাত্য। পাশাপাশি বর্ণনা দিয়েছেন চারপাশের চলমান, রুদ্ধশ্বাস জনতার, যে জনতার অধিকাংশই কেরানিশ্রেণির। *ওয়েস্টল্যান্ড* কাব্যে এ শ্রেণির রুদ্ধশ্বাসগতির সাথে এলিয়ট আমাদের একদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। পায়ের দিকে মুখ রেখে বৃত্তাবদ্ধ এক কলমপেষা নতজানু কেরানিশ্রেণি কাজ শেষে যখন লন্ডন ব্রিজের ওপর দিয়ে বাড়ি ফেরে, তখন কেবল তাদের ক্লান্ত পদচারণাই দৃশ্যমান হয়। "আমি কিছুই কিনবো না" কবিতায় এলিয়টের সেই কেরানি শ্রেণিকেই যেন আমরা নব্য ঢাকার পথে দেখতে পাই:

আমাকে পেছনে রেখে চলে যায় সারে–সারে কত ক্লার্ক
আঙুলে কালির দাগ, মুখে ভয়
টাইপরাইটারে ছাওয়া সারা দেশ, কি মুখর, উন্মুখর
কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ, শাড়ি
ঝলমলে ছোটবড় ঘড়ি
(আমি কিছুই কিনবো না)।

কবিতায় উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত দুটো শ্রেণিরই দেখা মেলে। এখানেও কবি কিন্তু এই দুই শ্রেণির কোনো শ্রেণির মধ্যেই নিজেকে যুক্ত করেননি। কবিতার শেষাংশে কবি এই আধা সামন্ত, আধা বুর্জোয়া নাগরিক জীবনের সাথে এক প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন। কেননা নগরের চারপাশে তিনি দেখেন উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সম্পদ বন্টনে প্রবল অরাজকতা, গভীর বৈষম্য। সভ্যতার পণ্যবাদী ঝা চকচকে চেহারার পাশাপাশি কেরানি জীবনের নিষ্কপর্দক সত্তার ক্লান্তি তাঁকে ব্যথিত করে। কাজেই শেষপর্যন্ত তিনি লেখেন:

ম্লান আলোর নীচে দীপ্তিমান জ্বলজ্বলে কমলা
আর আপেলের ঝুড়ি
আর আমার পকেটভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার
জয়ধ্বনি থেকে ক্রন্দনে আমি
উদ্ধত পতাকার নীচে একা, জড়োসড়ো–
– আমি কিছুই কিনবো না!
(আমি কিছুই কিনবো না)।

'পণ্য-উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে মানবিক সত্তার চরম অবমাননা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যান্ত্রিকায়ন, শ্রম-বিভাজন, স্বাতন্ত্র্যচেতনা কঠোর বিশেষজ্ঞায়ন, ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা, জাগতিক পরাভব– এসব প্রবণতা ব্যক্তিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ...এ অবস্থায় সমাজস্থ প্রতিটি মানুষই নিরতিশয় একাকিত্ব, গভীর অনিশ্চয়তা, তীব্র উৎকণ্ঠা ও দুর্মর নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত হয়ে পরস্পর থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৩: ৩১)। বিচ্ছিন্নতার এই বেদনা *উত্তরাধিকার* কাব্যের পাতায় পাতায় মুদ্রিত। "দুই প্রেক্ষিত" কবিতায়ও কবি পুঁজিবাদী সমাজের পণ্যলোভী মুখাবয়বের দেখা পান, যেখানে 'একটি উজ্জ্বল বড় মুদ্রা জ্যোতিচক্রের মত' কবি লিখেছেন 'ঘিরেছে জীবনকে', যদিও তিনি বলতে চান 'গ্রাস করেছে জীবনকে'। এই পণ্যগ্রাসী সভ্যতার মুখ ও মুখোশ তাঁর ভেতর তীব্র ঘৃণা আর বিবমিষার জন্ম দেয়। যে চাঁদের রশ্মিতে চন্দ্রাহত হবার কথা ছিল এ সভ্যতার রোমান্টিক সত্তার, সেই চাঁদের আলোয় সভ্যতাসৃষ্ট কুৎসিৎ মুখে তিনি বিবর্ণ, কদর্য মুখোশ দুলতে দেখেন:

রাতে চাঁদ এলে
লোকগুলো বদলে যায়
দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির ছায়া পড়ে
যেন সারি সারি মুখোশ দুলছে কোন
অদৃশ্য সুতো থেকে...
(ইন্দ্রজাল)।

"ভরা বর্ষায়: একজন লোক" কবিতায় কবি নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন। এক দুর্মুখ মেঘের দিনে তিনি একা বসে থাকেন স্মৃতিকাতর সত্তায়, যেখানে 'মৃত নিরুত্তর চাদরের ভাঁজ থেকে লাফিয়ে ওঠে রাগী ফণার মত কারো অনুপস্থিতি/ কিংবা স্মৃতি কিংবা নিঃসঙ্গতা'। কবি তাঁর নিঃসঙ্গ সত্তায়ই অবলোকন করেন উৎসবমুখর নাগরিক জীবনের চাঞ্চল্য। যদিও সেই চাঞ্চল্য ছাপিয়ে তিনি প্রকট হয়ে উঠতে দেখেন 'শাদা-শাদা নিষ্করুণ বিষণ্ন, ঠাণ্ডা, মরা জামা ("ভরা বর্ষায়: একজন লোক")'। এই যে দুর্মর নৈঃসঙ্গ্য কবিকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে বেসামাল পণ্যের সভ্যতা থেকে, সে শুধু বিপন্নকাল থেকে উদ্ভূত বেদনাবোধজারিত, স্বশ্রেণিচ্যুতির অভিমানজাত। এই বেদনা প্রবল হয়ে ওঠে "শীত" কবিতায়। শীত, কবির কাছে তাঁর ফ্লনিয়র সত্তার আরেক রূপ। কবি উচ্চারণ করেন নির্দ্বিধায়:

এ-শীতে একা, উদ্ধত আমি,
আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল
যে রিক্তগাছ, সে ঈর্ষায় সুখী
নিয়ত উত্তাপ দিই বন্ধু পরিজনে।
আমি শুধু
একাকী সবার জরার মুখোমুখি।
(এই শীতে)।

"সঙ্গতি" কবিতায় কবি শুধু একাই নন, তিনিসহ কাতারে কাতারে ব্যক্তিগত দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা আরো কিছু নামহীন বিকৃত মুখের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি; এদের প্রত্যেকেই নিজেকে বৃত্তাবদ্ধ করে রেখেছে জনজীবন থেকে, অচেনা এক ফ্লনিয়র সত্তায় তারা একে অপরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। কবি উপলব্ধি করেন, এদের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে লুকোনো আছে 'নিতান্ত নিজস্ব কাঁচ'। এ কাঁচ বিচ্ছিন্নতার কাঁচ। সমাজসৃষ্ট বৈষম্য থেকে উদ্ভূত এ কাঁচই কবি ও কবির মতো সংবেদশীল সত্তাকে বিচ্ছিন্নতার ঘেরাটোপে বন্দি করেছে। মূলত 'সমাজসংগঠন এবং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্বের ফলই হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। দ্বন্দ্বসম্ভবে এই বিচ্ছিন্নতাই ব্যক্তি-মানসে বপন করে নিঃসঙ্গতার বীজ। পুঁজিবাদী সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও অভ্যন্তর বৈপরীত্য, রেনেসাঁ-উত্তর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সমাজচৈতন্যের ক্রমভঙ্গুরতা, বেকারত্ব ও শ্রমশোষণ, যন্ত্রশাসিত ব্যক্তির অনিশ্চিত অবস্থান, সমরশঙ্কা, ঈশ্বরের মৃত্যু, অন্তর্গত অস্তিত্বের যন্ত্রণা এবং মানুষের চিত্তজাগতিক বিপন্নতা ব্যক্তিচৈতন্যে সৃষ্টি করে নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৩: ২৮-২৯) এ বৃত্তাবদ্ধ, নিঃসঙ্গশৃঙ্খলিত জীবন থেকে মুক্তি মেলে না "জানালা থেকে" কবিতায়ও। কবির চারপাশে শৈশব-কৈশোরে যে দৃষ্টিহীন আকাশ ছিল আদিগন্ত, যেটি ক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতপিষ্ট হয়ে নেমে এসেছিল কবির চারপাশে, সেই চারপাশ এখন শুধুই হয়ে ওঠে 'অপরিসর শয্যার চৌহদ্দি' ("জানালা থেকে")। কবির চেতনায় চেপে বসে সেই অপরিসর শয্যার একঘেঁয়েমি:

আর আমি অপরিসর শয্যার চৌদিকে
অস্তিত্বের সীমা টেনে
দীর্ঘশ্বাসের কালো ফুলে সাজাবো স্মৃতির বাসর!
নিঃসঙ্গতাকে যৌবনের পরম সুহৃদ জেনে
তার সহোদরা কান্নার বাহুবন্ধে সঁপে দেবো

স্বপ্নের সত্য আর সত্তার সার
এবং আমার জানালা থেকে
নিরুপায় একজোড়া আহত পাখির মত চোখ
রাত্রিভর দেখবে শুধু
দূর দর-দালানের পারে
আবছা মাঠের পর নিঃশব্দে ছিন্ন ক'রে জোনাকির জাল
ছুটে গেল যেন এক ত্রস্ত ভীত ঘোড়ার কঙ্কাল!
(জানালা থেকে)।

এ জানালা কবির চেতনার জানালা, যেখান থেকে কবি তাঁর বিচ্ছিন্ন সত্তাকে এক ভীত ঘোড়ার কঙ্কালের মতো ত্রস্ত গতিতে চলমান দেখতে পান। কবির চেতনাদৃষ্টি নিরুপায় হয়ে সেই ত্রস্ত সত্তার পদচারণা টের পায়। শুধু এ কবিতায়ই নয়, "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায় স্বপ্নহীন এক সত্তার চেতনায় কেবলই রচিত হয় গহ্বর, কবর, ম্লান পাণ্ডুর রোগের রাত আর শীতার্ত শয্যা, নষ্টফল, সভ্যতার মৃত অস্ত্র। যে দশকে তাঁর পদচারণা, তাকে তিনি 'উদ্বাস্তু দশক' হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেননা ষাটের দশক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সময়। সামরিক শাসনে দমন পীড়নের তিক্তাভিজ্ঞতা, মত প্রকাশে অবরুদ্ধতা, ৬৬-এর ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মতো সামাজিক-রাজনৈতিক টালমাটাল সময়প্রতিবেশ সৃজনশীল সত্তার ভেতর আত্মমগ্নতার জন্ম দেয়, অস্থিরতার জন্ম দেয়। কাজেই অনিকেতচেতনায় জর্জরিত কবি এ দশককে অভিহিত করেন 'উদ্বাস্তু দশক' হিসেবে। আশৈশব লালিত জীবন ছেড়ে এ দেশের মাটি ও মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়েও কখনও কখনও উদ্বাস্তুর বেদনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতার মতো রহস্যঘন রোমান্টিক সৌন্দর্য তিরোহিত হয়ে তাঁর নামাঙ্কিত "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতায় সময়ের বীভৎস মুখাবয়ব রচিত হয়েছে। সমকাল তাঁকে বিধ্বস্ত করে তোলে। কাজেই এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তাঁকে কবিতার শুঁড়িলোকেই নিমগ্ন হতে হয়। নারীর বাহুর বিন্যাস নিবিড় হওয়া সত্ত্বেও কবিপ্রিয়ার চেতনায় গুমরে ওঠা কান্না স্পর্শ করে না কবিকে ("পরস্পরের দিকে")। এটিও সেই বিচ্ছিন্নতাবোধজাত অজ্ঞাত এক সত্তাকেই প্রবলভাবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ আবেগময়তাও কবিকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ।

বিনষ্ট সভ্যতার অমোঘ পচন তিনি রোধ করতে পারবেন না কিংবা রোধ করতে চান না। "পতন" কবিতায় কবি উপলব্ধি করেন সবকিছুর শেষ গন্তব্য পতন অথবা পচন। সেই পচন রোধ করবার অক্ষমতা কিংবা স্বেচ্ছা অক্ষমতা তাঁকে বেদনাবিদ্ধ করে। তাঁকে নৈঃসঙ্গ্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে:

নিঃশব্দে পচনে যায় নীলরঙা মাছিদের উল্লোল উৎসবে
টেবিলের উজ্জ্বল রেডিয়ো–একদিন জ্বলে না ডায়াল তার
নিরালোকে পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ ধুলোর আস্তরণে বহুদিন
একে একে খসে পড়ে প্রতি অঙ্গ, ঝলসে যায় ভাল্‌ভ
... ...
নরম পাৎলুন আর চকচকে চালাকির মত সব চোখামুখো জুতো,
পরিত্যক্ত একা ট্রেন রৌদ্রঝড়ে, বুড়ো মুখ পোড়ো জানালায়
প্রাচীন আর্শির মত পারা–ওঠা, সবকিছু আতঙ্ক রটায়।
(পতন)।

সমকাল আর সামসময়িক ভ্রষ্ট-রাজনীতি শহীদ কাদরীর চেতনায় যে পতনের আক্ষেপ মুদ্রিত করে, সেটি তিনি উপলব্ধি করেন নীরবে, সেই বিনষ্টি তিনি অবলোকন করে আত্মস্থ করেন এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি, নৈর্ব্যক্তিক-নির্মোহ ভঙ্গিতে পথ হাঁটেন। তাঁর চেতনায় লাল-নীল বাতি-জ্বালা এই সভ্যতার মোহনীয়তা কোনো আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয় না। বরং, তিনি উপলব্ধি করেন, চেতনায় জাগ্রত 'সকল আকাঙ্ক্ষা আজ পরাস্ত' ("চন্দ্রালোকে")। বিশল্যীকরণীসম চাঁদ কবির ভেতরকার বেদনা আর বিচ্ছিন্নতা প্রশমণে ঢালতে পারে না আর জীবনসঞ্জিবনী সুধা। ব্যর্থ চন্দ্রালোকে কবি তাঁর সকল পরাস্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনা ধারণ করেই ফ্লনিয়র সত্তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটান। "জন্মবৃত্তান্ত" কবিতায় কবির উপলব্ধি, তিনি যেন এক মন্দের পরামর্শে নিকষ বিচ্ছেদে হয়ে ওঠেন এক পর্যুদস্ত সত্তা।

যদিও এক বিপর্যস্ত সত্তা বহন করে কবি শহীদ কাদরী অজ্ঞাত সত্তাকে গ্রহণ করেন চেতনায়, তবু কোথাও কোথাও এ সত্তার বাইরে গিয়েও নিজের আত্মমুক্তির পথ তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। "নপুংসক সন্তের উক্তি" কবিতায় তাই বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত সন্তান হিসেবে পরিচয় দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন, 'বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান!/ আমাকে এড়ায় লোকে, জাতিস্মর অবচেতনার পরিভাষা/ যেহেতু নিয়েছি আজ নিষ্করুণ আর্তস্বরে সাহসীর মতো,/'– এই সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান হিসেবেই তিনি নিজের বিচ্ছিন্ন, ফ্লনিয়র সত্তাকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন, আত্মসমালোচনা করতে পেরেছেন, যেমনটি করতে পেরেছিলেন বোদলেয়র। সমালোচকের ভাষায়:

> স্বদেশ-সংলগ্ন হয়েও অবশেষে কবি নিজেকে মনে করেছেন নিঃসঙ্গ-উদ্বাস্তু, অনাত্মীয় একা এবং এই নগরের সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় তাঁর শ্বাসকষ্টও বেড়ে যায়। একসময় তিনি মর্মমূলে

> উপলব্ধি করেন,–এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত সন্তান তিনি। এইভাবে বোদলেয়ারীয় কুৎসিতের নন্দনচেতনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে তিনি নগরের কৃত্রিম-ক্লেদময় দেশী-বিদেশী বিমিশ্র উপকরণের ভেতর নিজেকে অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু আত্মানুসন্ধানের পথে বের হ'য়ে অবশেষে তিনি বোদলেয়ারীয় ক্লেদজ-কুৎসিতের ভাবনা পরিহার ক'রে তাঁর আন্তরমানসে কুৎসিতের অভ্যন্তরের এক বিরল সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছেন (অনু হোসেন, ১৯৯৬: ৩৭)।

বোদলেয়রের প্রভাব এ কালের কবিচেতনায় ছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বোদলেয়র যেমন বিশ্বাস করতেন, 'আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষাই কবিকৃত্য; কবির চৈতন্য এমন ক্ষমাহীন যে ঘুমিয়েও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না' (বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৯: ৯)। সেরকম দর্শনেই জারিত ছিলেন এ কালের কবিরা। শহীদ কাদরীও এর বাইরে নন। আর তাই "আমি কিছুই কিনবো না" কবিতায় ফ্লনিয়র ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্ন, ব্যথিত অস্তিত্ব তাঁকে বেদনাতুর করেছে। তবু, কবিতা শেষে পার্কের রেলিঙে বসে-থাকা বধির পাগলের অট্টহাসিতে তিনি ধ্বংসের খরতাল শুনতে পান; প্রবল অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যের এই সভ্যতায় এ অট্টহাসি হয়তো-বা ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির নব পূর্ণিমার আলো জ্বেলে দেবে– এ প্রত্যাশা তিনি করেন। এ প্রত্যাশা তাঁকে "পাশের কামরার প্রেমিক" কবিতায়ও শক্তি যোগায়। যে শক্তি তাঁর নিঃসঙ্গ সত্তার টুটি চেপে ধরে। নিজের আত্মার ভেতর ক্রমক্রিয়াশীল বিরক্তির নীল মাছি, হৃদপিণ্ডে বিরক্তিকর উৎকট নর্তন কিংবা ট্রেনে কাটা শূকরের লালরক্ত, মৃত্যু আর আর্তনাদ ছাপিয়ে শেষপর্যন্ত একজোড়া হিমহস্ত সকল হীমশীতলতা ঝেড়ে ফেলে বাজাতে পারে স্বপ্নক্রীড়া। "শত্রুর সাথে একা" কবিতায়, কবি হয়ে ওঠেন এমন এক প্রাণের প্রতীক, শত্রুর সাথে যে পাতায় এক গভীর মিতালি। অমোঘ প্রহরে একা প্রাণ কবি শেষপর্যন্ত গভীর বিচ্ছিন্নতার কালো পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে চান এই উচ্চারণে:

কতকাল আর বিরূপ দুখের পাড়ায়
অসম্ভবের পর্দা সরিয়ে প্রাণের
উত্তাপে তাকে পাবার নিবিড় আশায়
ক্ষয় করে তার দুর্লভ ক্ষণ গানের
প্রসন্ন মনে হারানো মেঘের খোঁজে
হেলায় হারায় কাল,
শত্রু যে তার শত্রুর সাথে মিতালি!
(শত্রুর সাথে একা)।

মূলত সমকালের অভিঘাত, অন্তর্ঘাত কিংবা পতনের বেদনায় কবি ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়েছেন, অজ্ঞাত এক সত্তার আধাররূপে নিজেকে পরিচিত করেছেন এবং অবশেষে ক্রমপ্রকাশিত ফ্লনিয়র সত্তার নির্মোহ তকমা থেকে মুক্তি পেতে কবিতাকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। পুঁজিবাদী সমাজে তিনি নিজেকে এক বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন, কেননা এ সমাজ শ্রেণিবৈষম্যের, এ সমাজ ও সভ্যতা কৃত্রিম মুখোশধারীর। এ সভ্যতায় তিনি তাই নিস্পৃহ পদচারণায় কালপাত করেন। তবু সংবেদনশীলতায় দিনশেষে এক অমোঘ ক্লান্তি ঘিরে ধরে তাঁকে। সেই ক্লান্তি আর সেই বিচ্ছিন্নতাজাত নৈঃসঙ্গ্যে তাঁর পরম আশ্রয় হয়ে ওঠে কবিতা। প্রবলভাবে উঠে আসে এক গভীর সত্য। কবিতার শরণ নিয়ে 'ক্ষীণায়ু মোমের মতো ম্লান সূর্য-প্রয়াণের পর/ অকায় অপেক্ষমাণ পড়ে-থাকা স্তব্ধ পটভূমি'তে তিনি সত্যসন্ধ-বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন: কবি-কিশোর 'তুই শুধু বেঁচে গেলি, বিভীষণ অন্যদের ছুঁলো ॥' ("কবি-কিশোর")।

সহায়ক গ্রন্থ

অনু হোসেন (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের কবিতা প্রসঙ্গে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০১৬)। "পশ্চিমের জানালা: শহীদ কাদরী", *অভিবাদন শহীদ কাদরী*, সম্পাদক: শামসুজ্জামান খান। বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃ.৩৯-৪৫।

তারানা নূপুর (২০০৬)। "শহীদ কাদরীর কবিতা: সময়, সংকট ও সংবেদনা", *উলুখাগড়া*, সম্পাদক: সিরাজ সালেকীন, ঢাকা। পৃ. ১১৪-১২৫।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৩)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৯)। *বোদলেয়র তাঁর কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *শামসুর রাহমানের কবিতা: অভিজ্ঞান ও সংবেদ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৬)। "শহীদ কাদরীর কবিতায় জল ও ডাঙার দ্বৈরথ", *কালি ও কলম*, সম্পাদক: আবুল হাসনাত, ঢাকা। পৃ. ৭-১১।

মলয় রায়চৌধুরী (২০১৯) "মহানগরে পথচর বোদলেয়র", available at: https://malayerprobondha.wordpress.com/2019/11/25/মহানগরে-পথচর-বোদলেয়র-মল/, accessed on: January 25, 2020.

মাহমুদ কামাল (২০১৭)। "স্যাড জেনারেশনের রফিক আজাদ", *অমেয় আলোর কবি রফিক আজাদ*, সম্পাদক: মিন্টু হক, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, পৃ. ৫২৮-৫৩৪।

মোহাম্মদ আজম (২০২০)। *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, কবিতাভবন, ঢাকা।

শহীদ কাদরী (১৯৯৩)। *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শহীদ কাদরী (২০১৯)। "প্রবাসে, তবু বাংলাদেশের হৃদয়ে", সাক্ষাৎকার: জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। *শহীদ কাদরীর সঙ্গে কথাবার্তা*, সম্পাদক: মুহিত হাসান, বাতিঘর, ঢাকা। পৃ.১৫-৪১।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯২)। *আধার ও আধেয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৩)। *শামসুর রাহমান/ নিঃসঙ্গ শেরপা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Charles Baudelaire (1995). *The Painter of Modern Life and Other Essays.* Translated and edited by Jonathan Mayne. London and New York: Phaidon press.

Karl Marx (1977). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Progress Publishers, Moscow.

T. S. Eliot (1983). *The Norton Anthology of Poetry*. London and New York: W.W. Norton and Company.